শ্রীশ্রী বাবা ঠাকুরের ছেলেবেলার অসংখ্য অলৌকিক কাহিণীর খন্ড চিত্র

পুস্তক সূত্র - পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর

প্রথম পর্ব

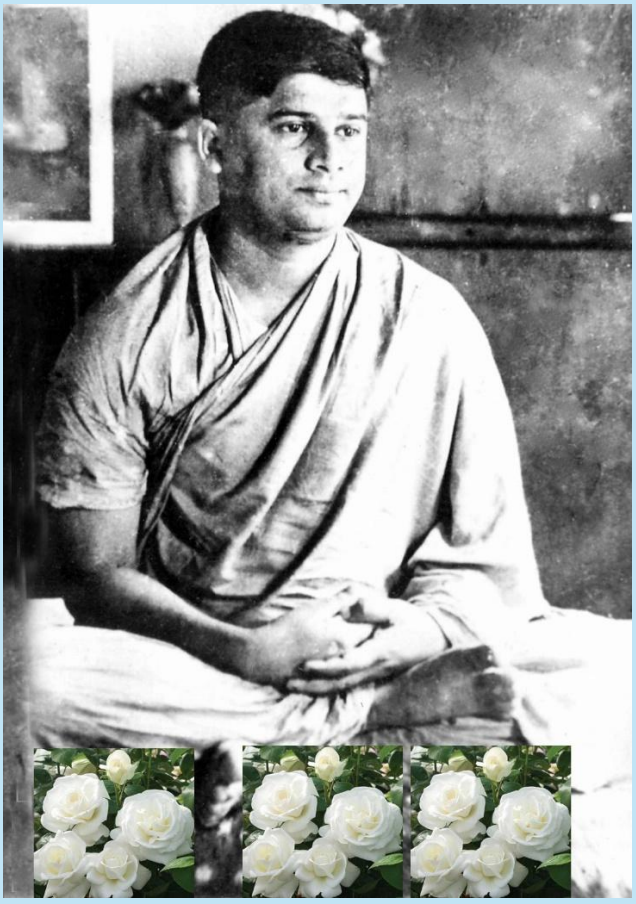

কৈশোরে শ্রীশ্রী বালক ঠাকুর

(শ্রদ্ধেয় বাবা ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শৈশব ও কৈশোরের ঘটনা অবলম্বনে)

রাম নারায়ণ রাম

শ্রীশ্রী ঠাকুরের ছেলেবেলার অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবহুল জীবন 'পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর' বইতে সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বইটির পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আমাদের পরম পূজনীয় বেলাভেড ঠাকুর বারবার বলেছেন। তিনি আমাদেরকে শ্রীশ্রী বাবা ঠাকুর কে জানার ও বোঝার জন্য 'পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর' ভালো করে পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। জন্ম মুহুর্ত থেকে ঘটে যাওয়া শ্রীশ্রী ঠাকুরের অসম্ভব সব কার্য্য প্রণালী আপাত দৃষ্টিতে ম্যাজিকের মত মনে হয়। বাবা ঠাকুর যে জন্মসিদ্ধ সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্য এ'রকম অসংখ্য ঘটনা, সূক্ষ্ম বোধ ও বিশ্লেষণ দিয়ে আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। আমাদের মতো গৃহী খুব সাধারণ মাত্রার, ঠাকুরকে পেয়েও যারা সঠিক উপলব্ধিতে আনতে পারেনি তাদের জন্য ও নতুন প্রজন্মের ছোটদের আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষণের অভিলাষে শ্রীশ্রী বাবা ঠাকুরের বছর ৭-৮ সময় কালের টুকরো টুকরো ঘটনা এখানে গ্রন্থিত করলাম। এটা প্রথম পর্ব। ইচ্ছা রইল পরের পর্ব ক্রমশঃ প্রকাশ করবার।

বৈদিক বাড়ীর ইতিহাস

মহাপ্রভুর মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বাসস্থান ছিল ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাউলীপাড়া গ্রামে। বিষ্ণুদাস ঠাকুরের দশম উত্তরপুরুষ হরনাথ শিরোমণি প্রথমে কাউলীপাড়া ছেড়ে আসেন। সে এক বিচিত্র ঘটনা। হরনাথ শিরোমণির স্ত্রী প্রাতঃস্নান সমাপ্ত করে তুলসী তলায় প্রণাম করতে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ মাটির ফাটল দিয়ে এক ঝলক জল এসে তাঁর মুখে লাগল। অতীব বুদ্ধিমতী হরনাথ-গৃহিনী তখনই আশু-বিপদের সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করলেন; বুঝতে পারলেন কীর্তিনাশা পদ্মা তল দিয়ে খেয়ে গেছে এবং কাউলীপাড়া গ্রাম শীঘ্রই পদ্মার গ্রাসে পড়বে। বিরাট গ্রাম-সেখানে পোস্ট অফিসই আটটি, হাইস্কুল ২৪টি, টোল, থানা তো আছেই - এই বর্ধিষ্ণু গ্রাম পদ্মার গ্রাসে বিলীন হয়ে যাবে। হরনাথ-গৃহিনী এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সবাইকে এই বিপদের কথা জানিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে গ্রাম খালি হয়ে গেল - যে যতটুকু উদ্ধার করতে পারে তাই নিয়ে বিপদ সীমা পেরিয়ে চলে গেল। বিরাট গ্রাম কয়েকদিনের মধ্যেই পদ্মার বুকে বিলীন হয়ে গেল। হরনাথ শিরোমণি পরিবারবর্গ নিয়ে একের পর এক কয়েক জায়গায় আশ্রয় হারিয়ে শেষপর্যন্ত দোগাছি গ্রামে এসে বসবাস করতে লাগলেন। ছোট্ট গ্রাম, একটি ছোট পোস্ট অফিস আছে। সেখানে সবকিছু করা যায় না। স্কুল, থানা বা হাট নেই, আছে শুধু ছোট একটি বাজার। গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট কাটা খাল - নাম তার 'আঠারো-বেঁকী, পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। **মাতা চারুশীলার (শ্রদ্ধেয় বাবা ঠাকুরের মাতা) জন্ম এই দোগাছিতেই।**

প্রায় এক-দেড় মাইল দূরে মেদিনীমণ্ডল গ্রাম। দোগাছির থেকে বড়। ষ্টীমার ষ্টেশন, পোস্ট অফিস, বাজার সবই আছে যদিও হাই স্কুল বা থানা নেই। গ্রামের দক্ষিণে কীর্তিনাশা পদ্মা। পদ্মার পাড়ে একটি ছোট ষ্টেশন - মেল ষ্টীমার থামে না, থামে শুধু মিক্সড ও মালবাহী জাহাজ। ষ্টীমার ষ্টেশন থেকে কালিরখিল খালপাড়ের রাস্তাটি ধরে উত্তর দিকে গেলে বাজার ছাড়িয়ে যে বাড়ীটি চোখে পড়ে, **সেইটিই বৈদিক বাড়ী বা বারো ভাইয়ের বাড়ী (শ্রদ্ধেয় বাবা ঠাকুরের পৈতৃক বাড়ী) বলে পরিচিত।** বৈদিক বাড়ী নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে বিশারদ পণ্ডিতেরা সেখানে বসবাস করেন।বৈদিক বাড়ীর ইতিহাস তখনকার বঙ্গদেশের অধিপতি বল্লাল সেনের সঙ্গে ওতঃপ্রতোভাবে জড়িত। বল্লাল সেন বৈদিক ক্রিয়াকর্মের জন্য কান্যকুব্জ থেকে সদ্‌ব্রাহ্মণ নিয়ে এলেন। কথিত আছে প্রথম যাঁদের এনেছিলেন তাঁদের কাজের মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল। তাই যাজনিক ক্রিয়ার জন্য তিনি দ্বিতীয় এক পরিবার নিয়ে এলেন। তাঁরাই যাজনিক ক্রিয়াবিদ্ হিসাবে ঢাকা বিক্রমপুরে প্রসিদ্ধ এবং তাঁদের বাসস্থান ঢাকা বিক্রমপুরে 'বৈদিক বাড়ী' বলে খ্যাত। তখনও পূর্ববঙ্গে অনেক বৈদিক-ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবু বল্লাল সেন 'বৈদিক বাড়ীর ব্রাহ্মণদেরই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন। কথিত আছে যে বল্লাল সেন এঁদের একটা মাসোহারা করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এঁরা দানগ্রহণ করাতে অস্বীকৃত হওয়ায় জমি, গাভী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বৈদিক বাড়ীর পূর্বপুরুষেরা সেই ঋণ নিজেরা পরিশ্রম করে কড়াক্রান্তি পর্যন্ত শোধ করে দেন। একবার পরীক্ষা করার জন্য বল্লাল সেন লোক মারফৎ পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বৈদিক বাড়ীর সেই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ সেই টাকা গ্রহণ করলেন না, বললেন, 'চাষবাস, গো-সেবা, যজন-যাজন, বেদ-অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা আমাদের বৃত্তি। আমরা দান গ্রহণ করে আদর্শচ্যুত হতে পারি না।'

জন্মসিদ্ধ বালক ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব

১৩২৭ সালের ২৩শে কার্তিক, মঙ্গলবার ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই শুভদিনের রাত্রি ১০ টা ২০ মিনিটে এসেছেন সেই জন্মসিদ্ধ মহান (শ্রদ্ধেয় বাবা ঠাকুর), যার আগমন বার্তা জানিয়ে গেছেন আদিত্যনাথ বাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, প্রভু জগবন্ধু প্রমুখ সাধু-সন্ত-মহাপুরুষ।

বারো ভাই এর বৈদিক বাড়ীতে দীপান্বিতার দিন কালীপূজা হয়ে আসছে বংশ পরম্পরায়। অন্যবারের মতো সেই বছর ও পূজার আড়ম্বরের কোনো ত্রুটি নেই – আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীতে বাড়ী জমজমাট। ঢাক , ঢোল , সানাই সবই আছে । যূপকাষ্ঠ তৈরী - মায়ের কাছে বলি দেবার জন্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আতসবাজী জ্বালিয়ে আনন্দ করছে । সর্বত্র আনন্দের কোলাহল মুখর আজ বৈদিক বাড়ী । পূজারম্ভের লগ্ন উপস্থিত , অথচ মিষ্টির থালা দেওয়া হয়নি। তন্ত্রধার ভগবতী ঠাকুর (সম্পর্কে বাবা ঠাকুরের জ্যাঠামশাই) চিৎকার করছেন। সামনে কাউকে না দেখে আসন্ন প্রসবা মাতা চারুশীলা চিনির থালা হাতে করে ব্রস্ত পদে উঠানে নামলেন। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে মাতা চারুশীলা অপ্রস্তুত - চিনির থালা হাত থেকে পরে গেছে। কি হলো কিছুই বুঝতে পারলেন না।

বড় জা মনোরমা দেবী মাতা চারুশীলার অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন । তিনি তো অবাক - বললেন " তোর তো সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে রে! " মাতা চারুশীলা হতবাক -পূজার নৈবেদ্য পড়ে গেছে । কোনো প্রসব বেদনা নেই কোনো ইঙ্গিত নেই । সারাদিন রান্নাঘরে কাটিয়েছেন কিছুই তো বুঝতে পারেন নি!

কি অনিন্দ্যকান্তি দেবশিশু - প্রাঙ্গনের আলো-আঁধারি পরিবেশেই শিশুর রং ফুটে বের হচ্ছে দেহের কোথাও কোনো ক্লেদ পঙ্কিলতার ছাপ নেই, মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র শিশুটিকে কেউ স্নান করিয়ে শুইয়ে দিয়ে গেছে। শিশু বুঝে-ভরা দুই চোখ মেলে চারদিকে তাকাচ্ছেন - যেন সবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে যাচ্ছেন।

এদিকে সাত জোকার শুনে ভগবতী ঠাকুরের হাত থেকে ঘন্টা পরে গেলো - সর্বনাশ ! পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে - অশৌচ, সুতরাং মাতৃ পূজা বন্ধ । সকলেরই মন ভারাক্রান্ত- এ কি অশুভ সূচনা! তার ওপর আবার শিশু নির্বাক, তবে কি এক বোবা শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে মাতৃ পূজায় বিঘ্ন ঘটালো? মনোরমা দেবী কিন্তু জন্মের এই অলৌকিকতা লক্ষ্য করছিলেন। তাই যখন সকলে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে দেখলেন, তিনি শিশুর কাছে হেঁট হয়ে বললেন, 'একটু কেঁদে দেখিয়ে দাও যে তুমি বোবা নও '। তিনবার তারস্বরে চিৎকার করে শিশু জানিয়ে দিলেন যে তিনি সুরে ভরপুর।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের জ্যাঠামশাই সুন্দর ঠাকুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী। জ্যোতির্বিদ হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। ....সমস্ত সংস্কার উপেক্ষা করে তিনি গণনায় বসে গেলেন। বললেন ' মহাদেবই দক্ষ রাজার যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন। আমাদের মাতৃ পূজা যিনি বন্ধ করলেন, দেখা যাক তিনি কোন মহাদেব ।'..... .....

পনেরো মিনিট কেটে গেলো। সুন্দর ঠাকুরের চোখে জল দেখে তাঁর ছাত্রেরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো 'পণ্ডিত মশাই কাঁদছেন কেন?' ঠাকুমা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ' কি রে

চন্দ্রকান্ত কাঁদছিস কেন ? কি হয়েছে? সুন্দর ঠাকুর জবাব দেন ' কাঁদছি কেন? এ কালাপাহাড় নয় , এ যে কালাচাঁদ. ..সন্ন্যাস নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আমরা উদ্ধার হয়ে যাবো , শুধু আমরাই নয় আমাদের সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। শুধু আমাদের কেন সমস্ত দেশ জুড়ে সবাই উদ্ধার হয়ে যাবে। আনন্দ করো- আমাদের সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে'। ঠিক সেই সময় সেই পাগল সাধক এসে উপস্থিত পিছন থেকে বললেন " হ্যাঁ হ্যাঁ , এসেছে রে , এসেছে। সবাই প্রশ্ন করতে লাগলো 'কে এসেছে?'

--- ' পরে বুঝবি, পরে বুঝবি' , বলতে বলতে পাগল সাধক শিশুকে দর্শন করে দ্রুতপদে চলে গেলেন।

পরে অনেকেই অবশ্য উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু সেই আবির্ভাব মূহুর্তেই জ্যেঠিমা মনোরমা দেবী জন্মের অলৌকিকত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। প্রচলিত নিয়মের মাধ্যমে যে এই আবির্ভাব হয়নি, সেটি তিনি বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন সুন্দর ঠাকুর। তাই তিনি সংস্কারের বাঁধা নিষেধ উপেক্ষা করে জন্মকুন্ডলী তখনই তৈরী করলেন।

জন্মসিদ্ধ শিশুর অলৌকিক ষষ্ঠীপূজা

সবারই ধারণা, শিশু বুঝে বুঝে প্রতি পদক্ষেপে চলেন। ছ' দিনের দিন ষষ্ঠী -শিশুর কল্যাণে পূজা। গ্রামের সব ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে - শিশুকে আশীর্বাদ করার জন্য। সকলের পায়ের ধূলা নবজাত শিশুকে গ্রহণ করতে হয়। পূজার সব আয়োজন প্রস্তুত। কিন্তু প্রকৃতির এমনই রহস্য যে সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হ'ল। নিমন্ত্রিতদের কারও আর আসা হ'ল না, কেউ আশীর্বাদ করতে পারল না। ছ'দিনের শিশুর সেদিনকার কার্যকলাপ তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে **বিস্ময়াপ্লুত** করে তুলেছিল। বৃষ্টি এক এক বার থেমে আসে, আর শিশু জোরে জোরে হাত নাড়তে থাকেন। **তাঁর হাত নাড়ার সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, তাঁর হাত নাড়ার গতি যেমন মন্থর হয়ে আসে, বৃষ্টিও কমে আসে – হাত নাড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেশীক্ষণ বৃষ্টি বন্ধ থাকতে দেন না, প্রবল উৎসাহে আবার হাত নাড়া শুরু করেন। বৃষ্টিও মুষলধারে নামতে থাকে। এই খেলা তাঁর সারাদিন চলে – বৃষ্টিও থামবার সুযোগ পায় না।** জ্যেঠিমা মনোরমা দেবী বেশ কিছুক্ষণ ধরে শিশুর এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে বৃষ্টি ধারার সম্বন্ধ লক্ষ্য করে সবাইকে ডেকে এনে দেখান। ছ'দিন বয়সেই প্রকৃতি যার নিয়ন্ত্রণাধীন – তিনি কে? – এই প্রশ্ন সবার মনে জাগে।

জন্মসিদ্ধ মহানের অলৌকিকত্বে ভরা শৈশব

শিশু ক্রমশ: কলায় কলায় বাড়ছেন বাড়ীর অন্য পাঁচটি শিশুর মত, কিন্তু তারও মধ্যে পার্থক্য আছে। আর পাঁচজনের মতই শিশু বড় হচ্ছেন, কিন্তু কত প্রভেদ! - সবাই যখন কাঁদে, তিনি তখন চুপ করে থাকেন। সবাই যখন চুপ করে, তিনি কেঁদে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বারো ভাইয়ের বৈদিক বাড়ীতে বাচ্চা শিশুর অভাব নেই, যে যখন সময় সুযোগ পান বাচ্চাদের বুকের দুধ খাইয়ে যান। কিন্তু এই দেবশিশু মা ছাড়া আর কারও বুকের দুধ স্পর্শ করেন না। মহিলাদের মধ্যে এটি একটি প্রচণ্ড কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। সকলেই শিশুর মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে মুখ লুকিয়ে নিজের বুকের দুধ এগিয়ে দেন। কিন্তু আশ্চর্য! শিশু ঠিকই বোঝেন, তিনি আর কারও বুকের দুধ স্পর্শ করেন না, মুখ ফিরিয়ে নেন। শেষে নিরুপায় হয়ে সকলেই চেষ্টা ছেড়ে দেয়।

ক্রমে শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় হয়ে এল। জল্পনা কল্পনা চলছে এমন সময় পিতা সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী র চাকরী ঠিক হয়ে গেলো। **সপরিবারে তিনি উজানচর -কৃষ্ণনগরে রওনা হলেন এবং রূপবাবুর জমিদারী সেরেস্তায় গিয়ে কাজে যোগদান করলেন। সুতরাং অন্নপ্রাশন স্থগিত রাখা হলো। অল্প মাইনে, মাস গেলে ১৯ টাকা পান - কোনমতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন্। উজানচর কৃষ্ণনগরেই শিশু বাড়তে লাগলেন, মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ী দোগাছি যান ওখান থেকে মেদিনীমণ্ডল যান (ঠাকুরের বাবার বাড়ী)।**

উজানচর - কৃষ্ণনগরের বাড়ীর কাছেই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। জন্তু-জানোয়ার, সাপ-খোপের উৎপাতও আছে। শেয়াল বাচ্চাদের নিয়ে গেছে – এ রকম ঘটনাও ঘটেছে। একদিন শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন মাতা চারুশীলা। তিনি রান্নার কাজে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে একটা শেয়াল বাচ্চার ঘরে ঢুকে পড়েছে, বাইরে থেকে তার লেজটি দেখা যাচ্ছে। কোথা থেকে 'বাঘা' কুকুরটা ছুটে এসে শেয়ালটার লেজ কামড়ে ধরলো। বাঘা দুর্ধর্ষ কুকুর – তার হাতে পড়লে আর রেহাই নেই। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধস্তির পর শেয়ালটা ওর হাতেই মারা গেল। এত যে চিৎকার, শেয়ালের অন্তিম আর্তনাদ – তাতেও শিশুর ঘুম ভাঙে না। পরম শান্তিতে শিশু ঘুমোন।

শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখেছেন। হামাগুড়ি দিয়ে নেমে উঠোনের শেষে ঝোপ-জঙ্গলের প্রান্ত পর্যন্ত চলে যান। **গোসাপগুলোর সঙ্গে খেলা করেন, লেজ ধরে টানেন, মুখে হাত ঢুকিয়ে দেন। গোসাপরা কিছু বলে না। তারা খেলার শেষে শিশুকে লেবু গাছের তলা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়।**

এক বছরের শিশুর অষ্টসিদ্ধির খেলা

বছর পেরিয়ে গেছে। হাঁটতে শিখেছেন, শিশুকে বসে রাখা কঠিন নিজের ধারায় তিনি চলতে চান। বছর পেরিয়ে গেছে। **মায়ের সাথে গেছেন মেদিনীমণ্ডল, মা খাইয়ে দিয়ে শিশুকে বিছানায় শুইয়ে রেখেও যান। পরক্ষনেই দেখেন , কি উপায়ে যেন শিশু বিছানা থেকে নেমে উঠানে গিয়ে খেলছেন। মা আবার তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন। কিন্তু কি অদ্ভূত , নিজে উঠানে পৌঁছাবার আগেই দেখেন শিশু উঠানে খেলছেন।** মা আশ্চর্য হয়ে যান, জ্যেঠিমারা

প্রমাদ গোনেন। বারবার একই ঘটনা ঘটছে- বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই দেখেন শিশু সেই উঠানে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন মা জ্যেঠিমা, মনোরমা দেবী বুঝিয়ে দেন শিশুর মাকে - ' **দেখতে তো পাচ্ছিস ও তো সাধারণ ভাবে হেঁটে আসছে না, অদৃশ্য হয়ে উড়ে চলে আসছে তা না হলে আমাদের আগে উঠোনে পৌঁছচ্ছে কি করে? শিশুর মাও এই অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেন কিন্তু মুখে শুধু বলেন ওর সবটাই কেমন অদ্ভুত!**

বছর দেড়েকের শিশু কি করে যে ইট দিয়ে উঁচু করা খাটের উপর থেকে অনায়াসে নেমে পড়েন দেখবার মতো। আবার জলচৌকি বা চেয়ার টেনে এনে কেমন সুন্দর বিছানায় উঠে পড়েন। **একদিন শিশু ঘুমের মধ্যে গড়াতে গড়াতে খাটের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। ঘরে তখন জ্যাঠামশাই সুন্দর ঠাকুর বসে বসে পান খাচ্ছেন। হঠাৎ শিশু খাট থেকে পড়ে গেলেন। কি আশ্চর্য ! মাটিতে পড়তে তাঁর বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগলো। সামান্য একটু শব্দ হলে, শিশু কেঁদে উঠলেন। শিশু অপূর্ব এক হাসি দিয়ে জ্যাঠামশাইকে অবাক করে দিলেন।** তাঁর এই ভাইপো যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে এসেছেন, তা সুন্দর ঠাকুরের অজানা নয়। ঘটনাটির পরে তিনি সবাইকে শিশুর অন্তর্যামীত্বের কথা জানালেন। **পান চিবোতে চিবোতে সুন্দর ঠাকুরের বাসনা হয়েছিলো। শিশুর কিছু অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখতে। এতো তাড়াতাড়ি যে তাঁর আশা পূর্ণ হবে , তিনি চিন্তাও করতে পারেননি। খাট থেকে শিশু মাটিতে পড়লেন এতো ধীরে ধীরে যেন একটি পালক পড়ছে - পড়ার শব্দ হল , তাও এতো সামান্য। শাস্ত্রে পড়েছেন অষ্টসিদ্ধির কথা সেদিন লঘিমা শক্তির বিকাশ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন।**

রূপবাবুর কাছারীর নায়েব ত্রৈলোক্য সোম আর শিশু ঠাকুরের পিতা সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ী প্রায় একবাড়ীর মতো। শিশুঠাকুর প্রায়ই ত্রৈলোক্য সোমের স্ত্রী শিশির কুমারীর কাছে থাকেন। ওঁর মেয়ে অণিমা আর শিশুঠাকুর প্রায় সমবয়সী। শিশির কুমারী শিশু ঠাকুরের মধ্যে অনেক কিছুই অদ্ভুত দেখেন। এতটুকু শিশু তাঁর মধ্যে এত ভাবগাম্ভীর্য আসে কোথা **থেকে। শিশির কুমারী প্রায়ই বলেন যে শিশুর দেহ থেকে একটা অপূর্ব গন্ধ বেরোয়। ত্রৈলোক্য সোম বিশ্বাস করেন না, বলেন ওর মা নিশ্চয় কোন সেন্ট মাখিয়ে দেন। শিশির কুমারী মানতে রাজী নন। বাজারের কেনা সেন্টের এটা নয়। যাই হোক তর্কাতর্কি না করে একদিন ছুটির দিন দেখে শিশুঠাকুরকে নিজেই গরম জল দিয়ে স্নান করালেন। পরিস্কার জামা কাপড় পরিয়ে দিলেন। কিন্তু আবার সেই সুমধুর গন্ধ শিশুর দেহ থেকে নি:সৃত হচ্ছে। ত্রৈলোক্য সোম সেদিন থেকে মেনে নিলেন যে সেই সুমধুর গন্ধ শিশুর সহজাত।**

গভীর ধ্যানে মগ্ন দুই বছরের শিশু ঠাকুর

দুই বছরের শিশু যে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। তাই মাতা চারুশীলা যখন ডেকে ডেকে পেতেন না, চারিদিক খোঁজাখুঁজি করেও ছেলের সন্ধান পেতেন না, তিনি বিরক্ত হয়ে উঠতেন। **শেষে খুঁজে পেতেন খাটের তলায় – ধীর স্থিরভাবে বসে আছেন। মা কিন্তু বুঝতেন না, তাই শিশুঠাকুর ভর্ৎসনার হাত থেকে রেহাই পাননি।**

সেবার জন্মাষ্টমীতে মাতা চারুশীলা শিশু ঠাকুরকে নিয়ে এসেছেন ঢাকাতে। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখবার মত। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মানুষ আসে মিছিল দেখতে। এমন বর্ণাঢ্য মিছিল বাংলাদেশে বিরল। ঢাকার এই মিছিলের তুলনা নেই, তাই দেশ বিদেশ থেকে মানুষ দেখতে আসে বর্ণে-সমারোহে পূর্ণ এই বিরাট মিছিল। হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে হরিনামাঙ্কিত নিশানে নিশানে রাজপথ প্লাবিত করে আসছে মিছিল। বৈদিক বাড়ীর মেয়েরাও এসেছেন মিছিল দেখতে – তন্ময় হয়ে দেখছেন বিশাল জনসমুদ্র আর রংয়ের বাহার। **মায়ের সঙ্গে শিশুঠাকুরও দেখছেন। হঠাৎ একটা রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে শিশু পড়ে গেলেন। মিছিলের কারও কারও এই দুর্ঘটনার দিকে নজর পড়লো - তারা চিৎকার করে উঠলো। মাতা চারুশীলা তাকিয়ে দেখেন শিশু পড়ে যাচ্ছেন – দুশ্চিন্তায় তাঁর মন কেঁদে ওঠে। কি করবেন বুঝতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অত উঁচু থেকে পড়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু!**

এদিকে শিশু পড়ছেন একটি হাল্কা পালকের মত অতি ধীরে ধীরে। সামনে সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন – মনে দ্বিধা, ভার সইতে পারবেন কিনা। শিশু এসে ভদ্রলোকের হাতের উপর পড়লেন। তাকিয়ে দেখলেন ভদ্রলোক – শিশু খিল খিল করে হাসছে। কোন ওজনই তিনি অনুভব করলেন না। দু'বছরের শিশুর এই লঘিমা-শক্তির বিকাশ দেখে মানুষ সেদিন আশ্চর্য হয়ে যায়। দ্বিগুণ উৎসাহে মিছিল চলতে থাকে।

তিন বছরের শিশু ঠাকুর অনেকের সমস্যার সমাধান

শশীকলার মত শিশু দিন দিন বাড়ছেন। তিন বছর পূর্ণ হতে আর বেশী বাকি নেই। বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়ারা শিশুর কথা শুনে হাসেন, বলেন - **'ও যে বিজ্ঞের মত কথা বলে, যেন সব জেনে বসে আছে। নিজের ইচ্ছা মত শিশু ঘুরে বেড়ান।**

একবার দেশের বাড়ীতে দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই একটু বিশ্রাম করছেন। শিশু এই ফাঁকে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। দুধের সর খেতে তিনি ভাল বাসেন। ঢুকেই দেখেন উনুনের পাশে মস্ত বড় একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সাপটা চলে না গেলে তিনি দুধের কড়াইয়ের কাছে যেতে পারছেন না – তাই রুটি বেলার বেলনটা নিয়ে সাপের দিকে তেড়ে গেলেন। সাপটা ফোঁস করে ফণা তুলে উঠলো। শিশু বেলনটা দিয়ে সাপটাকে মারতে যাচ্ছেন, সাপটাও মুখ সরিয়ে ফোঁস ফোঁস করে উঠছে। সাপের গর্জন শুনে কে একজন উঁকি মেরে দেখে, ভয়ে 'সাপ' 'সাপ বলে চেঁচিয়ে উঠল। **শিশুঠাকুর কিন্তু নির্ভীকভাবে সাপটার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত সাপটা ক্লান্ত হয়ে ঘরের নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল।** ইতিমধ্যে শিশুঠাকুরের মা-জ্যেঠিমারা এসে পড়েছেন। তাঁরা দেখছেন, কিন্তু এমন একটা অবস্থা যে এগিয়ে এসে কিছু করতেও পারছেন না। সাপটা পালিয়ে গেলে শিশুঠাকুরকে কোলে নিয়ে মাতা চারুশীলা ঘরে চলে গেলেন এবং মনে মনে অন্তর্যামীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

বয়স তিন বছর হলে কি হবে শিশু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। লোক যাতে বিরক্ত না করে তার জন্য কখনও তিনি সুপারি বাগানে , কখনও বা কলাবাগানে গিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হন। কতকগুলি শেয়াল মাঝে মাঝে এসে তাকেঁ ঘিরে বসে কিন্তু কোন ক্ষতি করে না। এদিকে শৃঙ্খলা বোধ বেশ আছে ঠিক সময়মতো বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন যাতে মায়ের কাছে ভৎসর্না খেতে না হয়। তাঁর সাথীরা মনে করতো -- এটাও আর একটা খেলা। ঘন্টার পর ঘন্টা একভাবে বসে থাকা অতটুকু বাচ্চার পক্ষে কি করে সম্ভব! খেলার সাথীদের সঙ্গে আবার কখনও কখনও খেলাও করেন। ক্রমে বয়স বাড়ছে। বয়স্ক সাথীদের সাথে আনন্দ মাস্টারের পাঠশালায় গিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকেন।

গ্রামের সরল মানুষ কিন্তু এই তত্ত্বরূপী শিশুকে চিনতে পারে এবং যখনই সুযোগ পায় শিশুকে মাঠের মধ্যে আসনে বসিয়ে পুজো করে তাঁর চরণামৃত নেয় ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান খুঁজে। শিশু ঠাকুর ওদের কথা মন দিয়ে শোনেন। আধো আধো দু একটি কোথায় ওদের সমস্যার সমাধান করে দেন শিশু ঠাকুরের কথা ওরা খুব মানে , **কারণ তাঁর কথা কখনও মিথ্যা হতে দেখেনি।**

ত্রৈলোক্য সোমের মেয়ে অণিমা শিশুঠাকুরের সমবয়সী। খেলতে খেলতে শিশুঠাকুর তাকে নানারকম সুস্বাদু, দুষ্প্রাপ্য ফল দেন। অসময়ে ঐ সুস্বাদু ফল অণিমার হাতে দেখে ত্রৈলোক্য সোম ওকে রাগ ক'রে জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে সে ঐ ফল পেল। কাঁদতে কাঁদতে অণিমা বলে, শিশুঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছে। দুই চারদিন এই ভাবে অনিমাকে ফল আনতে দেখে একদিন শিশুকে ডেকে পাঠালেন ত্রৈলোক্য সোম, জিজ্ঞেস করলেন, 'অণিমাকে তুমি ফল দিয়েছ?' শিশুঠাকুর বলেন, 'হ্যাঁ।' শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে ত্রৈলোক্য সোম আর কিছু বললেন

না। শিশুঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কথা তাঁর কানে আসে, সুতরাং আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

....মাঠের ধারে নিচু হয়ে হেলে পড়া গাছটার কাছেই বাচ্চারা খেলতে ভালোবাসে। সবাই গাছে ওঠে , লাফ দিয়ে ধুপ করে পড়ে । **শিশু ঠাকুর ও লাফ দিলেন কিন্তু তাঁর মাটিতে পৌঁছতে লাগে পাঁচ- দশ মিনিট। কাছে যারা ছিলেন তাঁদের অবাক লাগে এই অলৌকিক কান্ড দেখে।** লোকের মুখে মুখে এই কথা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে বিশ্বাস করতে চায়না, কিন্তু এতো প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার মুখে শুনে বিশ্বাস না করেও পারে না। **ক্রমে তাঁকে দেখার জন্য লোকের ভীড় বাড়তে থাকে।**

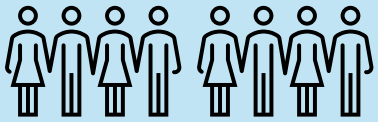

প্রথম জন্মোৎসব – বয়স ৪

গ্রামের অশিক্ষিত কিন্তু সহজ সরল মানুষই শিশুঠাকুরের দেবত্ব উপলব্ধি করতে পারে সর্বপ্রথম, তাই তারা মহানন্দে তাঁর জন্মোৎসব পালন করে। চার বছর বয়স – ভক্তেরা তাঁকে কাঁধে করে নাচে। শিশুঠাকুর আধো আধো ভাষায় বলেন – 'সবাই তোমরা ভগবানকে পাবে। ভগবানকে তো পেয়েই আছ, শুধু উপলব্ধি করতে পারছ না। সবার মধ্যেই তো ভগবান আছেন। ... 'সেই যে তত্ত্বের স্ফুরণ, পাঁচ বছর বয়স হতে না হতে তা' অফুরন্ত ধারায় নেমে আসতে শুরু করলো।

বয়স অল্প হলে কি হবে! প্রতিদিন এত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে তার হিসেব রাখা কঠিন। **ভক্তের সংখ্যাও যেমন বাড়ছে, শিশুঠাকুরের লীলাও তেমনি বাড়ছে। তাঁর স্পর্শে যদি কঠিন রোগ নিরাময় হয়ে যায়, তাঁর আশীর্বাদে যদি দুরূহ সমস্যা থেকে মানুষ মুক্তি পায়, তবে ভক্তেরা ভীড় করবে না কেন?**

শিশুঠাকুর একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেন, 'মা, আঁতুড় ঘরে একদিন মালসার আগুনের ফুলকি এসে আমার পেটে পড়েছিল না? পেটের এই দাগটা কি সেই ফোস্কার দাগ মা?' মাতা চারুশীলা তো অবাক! **চারদিনের দিন আগুনের একটা ফুলকি গিয়ে শিশুর পেটে পড়ে – একটা ফোস্কাও পড়েছিল - কিন্তু ও জানলো কি করে? শিশুঠাকুর বললেন, 'মা, সে কথা আমার বেশ মনে আছে। তুমি তাড়াতাড়ি কি একটা ওষুধ লাগিয়ে দিলে, তাই না?' চারুশীলা মুখে কিছু বলেন না, মনে মনে ভাবেন 'কী ধরণের ছেলে – আশ্চর্য করে দেয়! আর তো কেউ জানেও না যে ওকে বলবে।'**

এদিকে অলৌকিক ঘটনারও অন্ত নেই। একদিন শিশুঠাকুর ঘটি নিয়ে নদীতে গেছেন জল আনতে। একটু অসাবধান হয়েছেন আর এর মধ্যেই একটা ঢেউ এসে ঘটিটা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

ঘাটে বসে আনন্দ মাষ্টার আহ্নিক করছিলেন। শিশু ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'আমার ঘটিটা ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ওটাকে এনে দিন।' ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আনন্দ মাষ্টার বলেন, 'তুমি ভেব না, তোমাকে একটা নতুন ঘটি কিনে এনে দেব হাট থেকে।' শিশু কিন্তু ওই কথায় দমবার পাত্র নন। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঘটিটা অনেকদূর চলে গেছে। শিশু ঠাকুর জলের উপর দিয়ে এক দৌড় দিয়ে ঘটিটা ধরলেন, তারপর সাবলীল গতিতে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে এলেন। আনন্দ -মাষ্টার তো দেখে অবাক! এ কি করে সম্ভব! রক্তমাংসের শরীর নিয়ে জলের ওপর দিয়ে কী করে হাঁটতে পারে! এ দৈবশক্তি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

গ্রামের লোক যখনই কোন বিপদে পড়ে, বাচ্চা গোঁসাই-এর শরণাপন্ন হয়। সেবার ভীষণ খরা চলছে - মাঠ ফেটে চৌচির – চাষের কোন আশা নেই। চাষীরা এসে বাচ্চা গোঁসাইকে ধরলো – বৃষ্টি আনতে হবে। গোঁসাই মিটি মিটি হেসে বললেন, 'বৃষ্টি এখন খেলতে গেছে। খেলা শেষ হলে, তোমাদের যেমন ডেকে আনি, বৃষ্টিকেও ডেকে আনব, তোমরা বসো।' **কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে গোঁসাই বললেন, 'কই বৃষ্টি এল না তো। বৃষ্টি, না এলে তোমাকে দেখিয়ে দেব। আকাশে মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, প্রখর রৌদ্র-তাপে সব জ্বলছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথাও কিছু নেই, কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ মেঘ করে প্রবল বর্ষণ শুরু হ'ল। জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেল। চাষীরা আনন্দে বলে উঠলো, 'গোঁসাই, আর দরকার নেই।' বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল।** এই ভাবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করলেন। ওরা মনের আনন্দে বিদায় নিল।

অন্নপ্রাশন বা নামকরণ কোনটাই হয়নি। নাম রাখা হয়েছে বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী- বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, 'বীরু' বলে ডাকেন। **ভক্তেরা নাম ধরে ডাকতে চায় না, তাই বাচ্চা ঠাকুর, বাচ্চা গোঁসাই, বালক ঠাকুর, বালক গোঁসাই – যার যে নামে খুশী ডাকে।**

শিশুঠাকুর তিতাসের পাড়ের মাঠটায় প্রায়ই গিয়ে বসতেন ভক্ত পরিবৃত হয়ে। সেদিনও মাঠে বসে আছেন; হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই রে ডুবলো!' সবাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি ডুবলো?' **উত্তর এল, 'মেঘনা নদীতে হঠাৎ একটা নৌকা ডুবে গেছে, ওটাতে লালমোহন আর কেষ্টা আছে।' হাতটা সামনে বাড়িয়ে, পরমুহূর্তেই বলে উঠলেন, "এই তো দেখ, ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি।"** দুদিন পরে লালমোহন আর কেষ্ট নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এসে বললো যে, তারা অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভাবে যে বেঁচে গেল বুঝতেও পারল না।

পাঁচ বছরের বালক ঠাকুর

শিশু পাঁচ বছরে পড়েছেন। প্রায়ই তাঁকে দেখা যায় কখনও নদীর ধারে, কখনও সুপারী বাগান বা কলা বাগানে ধ্যানে মগ্ন। তাঁকে ঘিরে থাকে শেয়ালের দল, একটা জাতি-সাপও ফণা তুলে শান্তভাবে বসে থাকে। **সাত হাত লম্বা এই জাতি-সাপটা হঠাৎ একদিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঠাকুরের পিছু ধরলো। তিনি হাঁটলে, পোষা কুকুরের মত পিছন পিছন চলে। তিনি দাঁড়ালে, ও দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে এই সময় তিনি আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায় গিয়ে বসেন, সাপটাও পাঠশালা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, আবার বাড়ী ফেরবার সময় পিছু নেয়। এটা হ'ল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঘরের ভিতর যখন বসেন, সেই জাতি-সাপটা এসে বিড়া পাকিয়ে বসে থাকে।** এত বড় বিষধর সাপকে সেখানে দেখে সবাই ভয় পায় এবং সাপটাকে আসতে দেওয়ার জন্য সবাই অনুযোগ দেয়। শিশুঠাকুর তাঁর স্বভাবসুলভ সরলতায় মাখা আধো আধো ভাষায় বলেন, **"সাপটা দেখলে তো ভয় করে, কিন্তু ও আমাকে এত ভালবাসে যে কিছু বলতে পারি না।" শিশুঠাকুর ধ্যানে বসলেই সাপটা এসে হাজির হয়। সারারাত তিনি ধ্যানে বসে থাকেন, সাপটাও বসে থাকে।** ভক্তদের যখন উপদেশ-নির্দেশ দেন, সেও বসে শোনে আবার ভোর - হলেই চলে যায়। এই ব্যাপার দেখে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, 'এভাবে ও রোজ আসে কেন?' শিশুঠাকুর বলেন, "তোমরা যে কারণে আস, ও সেই একই কারণে আসে।"

পূজার সময়ে মায়ের সঙ্গে শিশু দেশের বাড়ীতে গেছেন। ধূমধাম করে কালীপূজা হচ্ছে। **বলি দেবার সময় হয়ে এল। শিশুঠাকুর তাঁর এক সাথীকে নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে পূজা দেখছিলেন। ছাগশিশুর আর্তনাদে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো। - তিনি তাঁর সাথীকে বললেন – 'এ বলি কিছুতেই হতে পারে না।' তিন-চার বার চেষ্টা করেও ছাগশিশুকে বলি দেওয়া গেল না।** শিশুঠাকুর নিশ্চয় কিছু করেছেন ভেবে সবাই তাঁকে ধরলো। শিশু দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'মায়ের সামনে তাঁর সন্তানকে হত্যা করবে আর মা সেটা নীরবে সহ্য করবেন – এ কখনও হতে পারে না।'

- 'কিন্তু এ তো শাস্ত্রের বিধান' - তাঁরা বলে উঠলেন।

- 'কখনই না, বলতে বলতে শিশুর মধ্যে এক দিব্য জ্যোতি দেখা গেল, 'শাস্ত্র বলে মনশুদ্ধির কথা, কারণ শুদ্ধ মনেতেই মহাশক্তির প্রকাশ হয়। মন শুদ্ধ করতে হলে ষড়রিপুকে বশে আনতে হয়। শাস্ত্রে ছাগশিশুকে বলি দেওয়ার কথা বলে নি, বলেছে জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে মনের কুবৃত্তিগুলিকে জয় করতে।' .....

পাঁচ বছরের শিশুর মুখে এই গভীর তত্ত্ব শুনে সেদিন সবাই অভিভূত হয়েছিল।

দেশের বাড়ীতে ভোর বেলায় স্নান করে বৈদিক বাড়ীর মেয়েরা পূজার ফুল তুলতে যায়। শিশুঠাকুরও ওদের সঙ্গে **যান। মেয়েরা ফুল তুলে সাজিতে ভরে, আর শিশু সেই ফুল নিয়ে নিজের পায়ে ঢালেন। মেয়েরা রাগ করে, বলে 'তোর কি সাহস, পূজার ফুল তোর পায়ে ঢালছিস!'**

শিশু জবাব দেন, 'কেন, কি হয়েছে? আমার পায়ে দিচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি, আমার ভাল লাগছে। তোরা তো পাথরের উপর ফেলবি – পাথর বুঝবেও না।'

মেয়েরা বলে, 'দেখিস, ভগবান রাগ করবে। ঠাকুর যখন শাপ দেবেন তখন বুঝবি।'

শিশু জবাব দেন 'তোদের ঠাকুর বুঝি খুব রাগী? আমি কিন্তু ঠাকুর হলে একটুও রাগ করতুম না। বরং সকলকে ভালবাসতুম – খুব ভালবাসতুম।' শিশুঠাকুর নিজের গায়ে ফুল ছেটান, নিজের পায়ে নমস্কার করেন। ওরা চটে গিয়ে বলে, 'তুই শিব-পূজার ফুল নষ্ট করছিস, বলে দেব।' **শিশুঠাকুর উত্তর দেন, 'চেঁচাচ্ছো কেন দিদি? মাটি, পাথর যদি ভগবান হয়, তবে আমার খেলার পুতুলটাও ভগবান ... ভগবান কোথায় নেই? মাটি যদি ভগবান হয়, তবে মানুষই বা ভগবান হবে না কেন?'**

মেয়েরা সেদিন বদ্ধ পাগল ভেবে শিশুর কথা উপেক্ষা করেছিল, কারণ ছোট ভাইকে কি আর অত সহজে মানা যায়! যে গভীর তত্ত্ব তিনি সেদিন দেন, তা বুঝবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

গৃহদেবতা গোবিন্দের মূর্তি সরিয়ে যেদিন নিজের খেলার পুতুলকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন, সুন্দর ঠাকুরের মত জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতও সেদিন কিন্তু সংস্কার দূর করে শিশুঠাকুর কি বলতে চাইছেন তা' বুঝতে পারেন নি। তাই গোবিন্দকে নিয়ে পাঁচ বছরের শিশুকে পুকুর পাড়ে খেলা করতে দেখে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠলেন, 'না জানি, কি অমঙ্গল হয়!'

শিশুঠাকুরের এক জ্যেঠামশায় হরেন্দ্র ঠাকুর তো ভীত কণ্ঠে বলেই উঠলেন, 'কি কালাপাহাড়ই এলো! শিশুঠাকুরের ঠাকুমা কিন্তু তাঁর প্রত্যয়ে অটল, 'তোরা যাই বল বাপু- কালাপাহাড়ই বলিস আর যাই বলিস, দেখবি একদিন ওই কালাপাহাড়ই কালাচাঁদ হয়ে আসবে।'

শিশুঠাকুরের শিক্ষাজীবন তখনও শুরু হয়নি, পাঠশালায় ভর্তি হন নি, তবু কলাপাতা বগলে করে আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায় গিয়ে মাঝে মাঝে বসেন। আনন্দ মাষ্টার শিশুকে খুব ভালবাসেন। শিশু - সাথীদের সাথে 'গাউছা-মাউছা' খেলছেন, একটা হেলানো পিটুলী গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ছেন, ছোটাছুটি করছেন। আনন্দ মাষ্টার তখন পিটুলী গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছেন। **শিশু লাফ দেবেন, বলে উঠলেন 'মাষ্টার মশায় ধরুন,' বলে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। আনন্দ মাষ্টার ঘাবড়ে গেলেন, ছেলেটির ওজন সইবার ক্ষমতা কি তাঁর আছে! কিন্তু কি আশ্চর্য!** শিশু যখন আনন্দ মাষ্টারের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আনন্দ মাষ্টার অবাক হয়ে দেখলেন **শিশুর দেহ পালকের মত হাল্কা! কি করে এটা সম্ভব! লঘিমা শক্তির কথা বইয়েই শুধু পড়েছেন, সেদিন শিশুর কাছে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পেয়ে আনন্দ মাষ্টার অভিভূত হয়ে পড়লেন।**

বিরাট শক্তির অধিকারী হয়েও কিন্তু শিশুঠাকুর বাস্তবের সব আচার-ব্যবহার নিখুঁত ভাবে মেনে চলেন। যে যা বলে, অম্লানবদনে তাই করে দেন। তাই অনেকের ফুটফরমাস তাঁকে খাটতে হয়। কারও পাকাচুল বেছে দেন, কাউকে গা টিপে দেন, কারো বা তামাক সেজে দেন।

নায়েব ত্রৈলোক্য সোমের জামাই আশু মজুমদার শিশুঠাকুরের সাজা তামাক খেতে খুব ভালবাসেন; বলেন, 'ও যে তামাক সাজে, তা খেতেও যেমন চমৎকার, চলেও তেমনি অনেকক্ষণ। আশু মজুমদার পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার - থাকেন নারায়ণগঞ্জে। যখনই কৃষ্ণনগরে আসেন, শিশুঠাকুরের হাতে সাজা তামাক খাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

সেদিন শিশুকে তামাক সাজতে বলেছেন। কাছারীঘরে ভীষণ ভীড় - কিসের দরবার চলছে। শিশুঠাকুর তামাক সেজে নিয়ে এলেন – কী অপূর্ব তার স্বাদ, কী চমৎকার গন্ধ! হঠাৎ আশু মজুমদারের খেয়াল হ'ল যে, তামাক তো রয়েছে কাছারীঘরে, ওখানে তো এখন ঢোকার উপায় নেই – আর শিশু তো উল্টোদিকে ওই বড় গাছটার পিছন থেকে এল! ওখানে তামাকই বা পেল কোথায়, আগুনই বা কোথায় পেল? আশু মজুমদারের মনে খট্‌কা লাগলো। তবে কি শিশুঠাকুরের ঐশ্বরিক শক্তির কথা যা' শুনে আসছেন বহুদিন ধরে, তা' সত্যি? সেদিন থেকে আশু মজুমদার আর শিশুঠাকুরকে তামাক সাজতে বলতে পারেন না।

শিশুঠাকুরের মধ্যে নানা পরিবেশে নানা ভাব ফুটে ওঠে। যাঁরা তাঁকে সন্তানের মত দেখেন তাঁদের কাছে তিনি দুরন্ত শিশু, ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ান – বয়সোচিত চঞ্চলতা, ছেলে-মানুষী দেখান আর তারই মধ্যে উপযুক্ত পরিবেশ দেখে আপন স্বরূপের কিছু আভাষ দেন। যাঁরা তাঁকে আর পাঁচ জন শিশুর মত ভাবেন - তাঁদের কাছে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখেন – তাই তাঁরা তাঁকে 'বুদ্ধিহীন' বলে ভাবতেও দ্বিধা করেন না।

শিশুঠাকুরের মাসীমা কমলা দেবী শিশুঠাকুরকে খুব স্নেহ করেন। মামাবাড়ী দোগাছিতে যখনই যান, মাসীমাই তাঁর দেখাশুনা করেন। খাবার সময় পার হয়ে যায়, শিশুঠাকুর কোথায় কোথায় যান খুঁজেও পাওয়া যায় না। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, সব জায়গায় বেশ জল দাঁড়িয়ে গেছে। মাসীমা শিশুঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করছেন, **এমন সময় দেখেন শিশুঠাকুর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন জলের ওপর দিয়ে; জায়গায় জায়গায় এক হাঁটুরও বেশী জল অথচ শিশুঠাকুরের পায়ের পাতাও ভিজছে না। অবাক বিস্ময়ে মাসীমা ভাবেন – 'কে ইনি!' শিশুঠাকুর দেরী করা স্বত্বেও সেদিন তিরস্কারের হাত থেকে তাই রেহাই পেলেন।**

তিনি কোথায় যে কখন থাকেন কেউ বলতে পারে না। **মেঘনা নদীর উত্তাল তরঙ্গের উপর ধ্যানাসনে পাঁচ বছরের শিশুঠাকুর যখন শান্ত সমাহিত হয়ে বসেছিলেন, হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান নদী-পাড়ে ভীড় করে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ মানুষের কোলাহল শুনে বেরিয়ে এলেন, দেখে তো হতবাক, জলের উপর বসে থাকা কি করে সম্ভব!** নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, আবার না করেও উপায় নেই। সবাই তো একই দৃশ্য দেখছে।

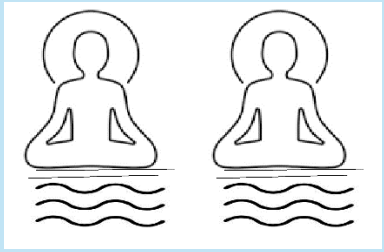

বালক ঠাকুরের শিক্ষা জীবন আরম্ভ

ক্রমে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হ'ল। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে – লেখা-পড়া তো শিখতে হবে! পিতা সুরেন্দ্রচন্দ্র **বালককে ভর্তি করে দিলেন লববাবুর পাঠশালায়।** পাঠশালা বললে সাধারণত: মানুষের মনে হয় একটি দীন, সংস্কারবিহীন ঘর – সেখানে ছাত্ররা একটা অনাড়ম্বর পরিবেশে, দেশীয় ধারায় শিক্ষালাভ করে। **শিক্ষার ধারা পাঠশালার ঐতিহ্য অনুসারে হলেও লববাবুর পাঠশালা ছিল নতুন টিনের বাংলো প্যাটার্নে তৈরী ঘর । সুন্দর রং করা ঘর। চারজন পণ্ডিত - তার মধ্যে লববাবুই প্রধান ছিলেন।** পাঠশালায় তিনটি ক্লাস - অধ্যয়ন শেষ করতে লাগে তিন বছর । পাঠশালার শিক্ষা শেষ করলে হাইস্কুলে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হওয়া যায়। **এই লববাবুর পাঠশালায় বালক ঠাকুর ভর্তি হলেন ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু পড়াশুনায় তাঁর মন নেই। কলাপাতা বগলে করে পাঠশালায় ঠিকই যান, কিন্তু পুরো লেখা কোনদিনই দেখাতে পারেন না – একটা গরু প্রায়ই পিছনে পিছনে আসে আর কলাপাতার অর্ধেক খেয়ে ফেলে- বালক খেয়ালও করেন না । লববাবুর পাঠশালা বালকের বিশেষ ভাল লাগে না, কারণ পণ্ডিত মশায় তুচ্ছকারণে পড়ুয়াদের যে গুরু শাস্তি দেন, তাতে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগে।** গোবিন্দ পণ্ডিত কঠোর শাস্তি দিতেন। - একদিন বালককেও শাস্তি পেতে হ'ল। আর সেদিনই ঘটনাক্রমে পণ্ডিতমশায়ের পেটে দারুন শূলব্যথা শুরু হ'ল। বালক বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, আপনার পেটের ব্যথাটা কমিয়ে দেব?' প্রথমে বালকের কথায় চটে গেলেও, শেষ পর্যন্ত ব্যথা সহ্য করতে না পেরে বালকের সেবা গ্রহণ করতে গোবিন্দ পণ্ডিত রাজী হলেন। **বালক ঠাকুর গোবিন্দ পণ্ডিতের পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন। সেই যে তাঁর শূলব্যথা ভাল হয়ে গেল, আর কোনদিন তাঁকে পেট-ব্যথা ভোগ করতে হয়নি ।**

আনন্দ মাষ্টার বাড়ীতে বালক ঠাকুরকে পড়ান। নিয়মিত তিনি পড়াতে আসেন ঠিকই, কিন্তু কাকে পড়াবেন? -পড়ায় যে বালকের মন নেই। **সব সময়ে কোন ধ্যানে বালক মগ্ন হয়ে থাকেন, আনন্দ মাষ্টার বুঝতে পারেন না।**

শেষে একদিন বললেন, "সবে পাঁচ বছর বয়স। ধ্যান-ধারণা কী জান না, জানবার কথাও নয়। পড়াশোনাও কর না, কিন্তু সারাক্ষণ দেখি চুপ করে বসে থাক। ডাকলে মনে হয় ঘুম থেকে উঠলে। কোথায় থাক তুমি?"

- কেন, আমি তো আমাতেই ডুবে আছি - এই বাস্তবজগতে বস্তুর সাথে মিশেই তো রয়েছি আমি। অনন্ত জগতের সুরের মধ্যেই তো ঘুরে বেড়াই। সবকিছুর সাড়াই তো পাচ্ছি আমি। সব কিছুর মাঝে তো আমি আমাকেই খুঁজে পাই।

- কই, আমরা তো সে সব বুঝতে পারি না?

- সবাই আমরা একই যোগাযোগে আছি। বিরাটের সুর - অনন্ত জগতের সেই সুর সবার ভিতরেই আছে। আপনারা মুখ বুজে আছেন, জিহ্বা কাজে লাগাচ্ছেন না - স্বাদ পাবেন কি করে? চিনি মিষ্টি ঠিকই আছে। কিন্তু জিভ লাগাতে হবে তো! জিভ দিয়ে চেটে চেটে তবে তো বিশ্বের স্বাদ পেতে হবে। তখন আসবে তন্ময়তা, আসবে গভীরতা। তখন দেখবেন খেয়াল থেকেও নেই - নিজের মাঝেই নিজেই তন্ময় হয়ে আছেন – সব কিছুতেই আপনি মিশে আছেন। **এই যে আস্বাদ নেবার জিহ্বা -**

বাস্তব জগতের দুঃখ-বেদনার সুরে, ব্যথা ও শোকের সুরে এটা খুলতে থাকে। মহাশান্তি ও পরিতৃপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এসব রোগ, শোক, দুঃখ যাতনা – আক্কেল দেবার জন্য নয়। প্রকৃতির নিয়মে সবারই সে জিহ্বা সহজ গতিতে স্বাভাবিকভাবে খুলছে। সবারই শক্তির স্ফুরণ হবে একদিন। ফুটিয়ে তোলার সেই নিয়মটা পালন করতে হবে। ঠিক সময়ে আপনিই ফুটে উঠবে। বীজ আকারে রয়েছে, গাছ আকারে বের হবেই। .... আনন্দ মাষ্টার অবাক হয়ে বালকের কথা শোনেন আর ভাবেন – 'কী শেখাবেন তিনি! সবই তো বালক জেনে বসে আছেন' তবু তাঁকে শিক্ষকের কর্তব্য পালন করতে হয়।

এত বিরাট তত্ত্বজ্ঞ – তাঁকেও বাস্তবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেসুরকে সুরে আনতে হয়। খেলার সাথীরা শুধু চঞ্চল দুরন্তই নয়, অনিষ্ট করার বুদ্ধিও তাদের মধ্যে আছে। প্রায়ই তারা পাখীর বাসা থেকে ছানা নিয়ে এসে পোষে । বালকের এটা মোটেই ভাল লাগে না। তিনি নিষেধ করেন কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। বিভিন্ন পাখীর বাসা থেকে ডিম নিয়ে এসে বালককে দেখায় । কোনটা কাকের, কোনটা শালিকের, কোনটা বা দোয়েলের ডিম। বালক বলেন, **"যা রেখে আয়।** ডিমটা ফুটতে কোনটা কুড়ি বাইশ দিন, কোনটা একমাস দেরী। ইচ্ছে করলে এখনই ফুটিয়ে দিতে এবং বাচ্চাকেও বুড়ো বানিয়ে দিতে পারি। **যে কারণে ডিমটা ফোটে, সেই কারণটা ওর মধ্যে জমাট করে দিতে পারলেই হ'ল।" একটা ডিম হাতে ছিল, বলার সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা ফেটে বাচ্চা বের হ'ল । আবার পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ছানাটা বড় হয়ে ডাকতে শুরু করলো – ওরা তো দেখে অবাক! দুই তিন বছরের পাখীর ক্ষমতা ওর মধ্যে এসে গেল। বালক ঠাকুর বললেন, 'কালই ও ডিম পাড়বে । ' তারপর ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এই মুহূর্তটা আনাই হচ্ছে প্রয়োজন, এটাকেই লাভ করতে হয়, যেমন ব্যবসায় লাভ করে। ' বালকের কথা তারা বুঝেছিল কিনা, বুঝলেও কতটা বুঝেছিল বলা শক্ত তবে সেদিন থেকে ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, বালকের কথা কখনও আর অগ্রাহ্য করে না তারা।**

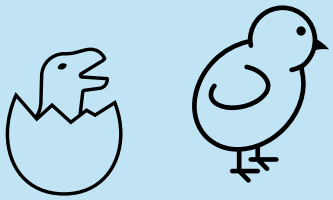

আবালবৃদ্ধবনিতা বালককে সমীহ করে চলে, কারণ তাঁর অন্তর্যামিত্বের কথা সবাই জানে। তাঁকে লুকিয়ে কেউ কোন কাজ করতে পারে না। বালক কখনও না-বোঝার ভান করে থাকেন, আবার কখনও কখনও তাদের মনের কথা, কি করছে না করছে, সবার সামনে বলে দেন। তাই বালকের প্রতি সকলেরই যেমন ভালবাসা, তেমনি শ্রদ্ধা-ভক্তি।

তিতাসের পাড়ে বিরাট মাঠটায় খেলাধূলার পর বালক প্রায়ই গিয়ে বসেন। সেদিন কয়েকশ লোক সেখানে জমা হয়েছে। প্রায় দু'শ আড়াইশ' লন্ঠনের আলোতে বেশ একটু আলো হয়েছে। ভক্তেরা ধূপধূনা জ্বালিয়ে দিয়েছে। বালক ঠাকুর মাঝখানে বসে আছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, **"তোমরা সবাই একটু লক্ষ্য রেখ – আমায় যেন বাতাসে উড়িয়ে না নেয়।" সকলেই সতর্ক**

হয়ে বালককে ঘিরে বসলো, মুখে চোখে একটা আতঙ্কের ছাপ - কি জানি কি হয়! দেখতে দেখতে আকাশ কালো করে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো । বালক গোঁসাই যেখানে বসে আছেন, সেখানেই ঝড়ের মাতামাতিটা যেন বেশী – হাওয়ার জোরে গোঁসাই দুলতে লাগলেন, আর কিছু দেখা গেল না। হঠাৎ তিনি উড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেলেন। – ঘটনাটি যে ঘটে গেল, কেউ টেরও পেল না। শুধু দেখলো বালক গোঁসাই নেই। একটু পরে নদীর ওপার থেকে গোঁসাই-এর গলা শোনা গেল, "আমায় নিয়ে যাও।" ফাল্গুন মাস - নদী পার হতেই চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট লাগে। খেয়া নৌকা চলে গেছে, সুতরাং উপায় নেই। চেঁচিয়ে সবাই বললো, 'যেভাবে গিয়েছো, সেই ভাবেই ফিরে এস।' একটু পরেই দেখা গেল বালক আগের মতই আসনে বসে আছেন – হাতে তাঁর কয়েকটি ক্ষেতের ক্ষীরা। সকলেই প্রসাদ পে'ল।

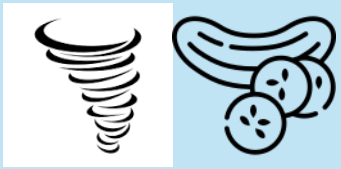

বালক ঠাকুরের একু হাজরার স্কু ল ও সহপাঠীদের পূজা

কিছুদিন পরে মাতা চারুশীলার সঙ্গে মামাবাড়ী দোগাছি গেলেন । সেখানে একু হাজরার [সুরেন হাজরার ডাক নাম একু হাজরা] স্কুলে ভর্তি হলেন। শিশুদের জন্য এই স্কুল - পাঠশালা নয়, কতকটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মত। লববাবুর পাঠশালায় বালকের পড়তে বেশী ভাল লাগতো না। লববাবু এবং পণ্ডিতমশাইয়েরা বালককে খুব ভালবাসতেন, সুতরাং বালক ঠাকুরের নিজের দিক থেকে কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু সামান্য কারণে পণ্ডিতমশাইয়েরা পড়ুয়াদের যে কঠিন শাস্তি দিতেন, সেটা তাঁর ভাল লাগতো না। একু হাজরার স্কুল একেবারে অন্যরকম – পড়াশুনা ভাল হয়। পরিবেশটাও বালকের পছন্দ। দুই একমাস পরে মা কৃষ্ণনগরে ফিরে গেলেন – **বালক মামাবাড়ী দোগাছিতে মাসীমার কাছেই রয়ে গেলেন। ক্লাসে পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী - সবাই বালককে ভালবাসে। শেফালী, জয়ন্তী, অন্নপূর্ণা, মোহন, বাদলী, মণির তো বালকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। সবাই একত্রে স্কুলে যায় - একত্রে বাল্যশিক্ষা পড়ে, একত্রে অঙ্ক করে। সবাই সমবয়সী এবং সহপাঠী, ভালবাসার অন্ত নেই, কিন্তু বালককে ওরা সবার সঙ্গে এক করে ভাবতে পারে না। ওদের কাছে তিনি হচ্ছেন 'গোপাল ঠাকুর' - যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায়, অন্তরে সযত্নে ধরে রাখা যায়, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক - তার মধ্যে এখানকার হিংসা, দ্বেষ, কলহ-বিবাদ ডেকে আনা যায় না।** সবাই এক পাত্র থেকে মধু পান করছে – কে বেশী পেল, কে কম পেল তা নিয়ে মান-অভিমান নেই, কলহ-বিবাদ নেই। সবাই বালকের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু কে বেশীক্ষণ পেল, কে কম সময় পেল তা নিয়ে কোন মন কষাকষি নেই, এমনি স্বচ্ছ ওদের ভালবাসা। অন্য সহপাঠীরাও বালককে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, কিন্তু তারা মান অভিমানের ঊর্ধ্বে তখনও উঠতে পারেনি। বালকের পরিবেশটি বেশ ভাল লাগে, কিন্তু বেশীদিন দোগাছির স্কুলে পড়া হ'ল না [বাংলাদেশ ছাড়বার পর আর শেফালী, জয়ন্তীর সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হয় নি, তবুও প্রায়ই তিনি তাদের অন্তরের টানের কথা বলেন]। পূজার ছুটি এসে পড়লো। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। পূজার ছুটিতে দোগাছির বাড়ীতে

মামা-মাসিরা সবাই এসেছেন। বালকের মা-বাবাও এসেছেন। **বালক ঠিক করলেন, পূজার পরে কৃষ্ণনগরে ফিরে যাবেন এবং আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায় গিয়ে ভর্তি হবেন।**

এদিকে পূজা কেটে গেল – কালী পূজা এগিয়ে আসছে। কালী পূজার দিন বালকের জন্মোৎসব – অনেক জায়গাতেই উৎসব করছে। **স্কুলের সহপাঠীরা সবাই মিলে ঠিক করলো, তারা বালকের জন্মোৎসব পালন করবে। বাড়ীতে সবাই বলেছে - বন্ধুর জন্মদিন পালন করবে। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলেছে - সবশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকা উঠেছে। তখনকার পঞ্চাশ টাকা কম নয়। তাই দিয়ে ফল, মিষ্টি প্রভৃতি কিনে পূজার আয়োজন করেছে।** বাড়ীর কাছেই একটা সপেটা গাছ ছিল। সেখানে ঠাকুর এবং তাঁর সমবয়সীরা 'গাউছা-মাউছা' খেলেন। গাছটা বেশ নিচু হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে বেড়ে চলেছে। গাছের গোড়ায় ঠাকুরের সহপাঠীরা মিলে ভাল করে গোবর লেপে পরিষ্কার করেছে। **সেখানে গাছের গোড়ায় একটি আসন পেতে ঠাকুরকে বসালো। ঠাকুরকে কেউ বলতো বন্ধু, কেউ বলতো প্রভু, কেউ বলতো গোঁসাই। বাড়ীতে সবাই বলে এসেছে, 'আজ আমাদের বন্ধুর জন্মদিন, আমরা সারাদিন ওখানে খাওয়া দাওয়া করবো'**। বয়সে বড় হলেও ঠাকুরকে খুব ভালবাসে বলে প্রফুল্ল হোড়, বাদল, কেরামত এবং আরও দুই একজনকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে – ওরা বিকালে আসবে। **শেফালী (সবাই 'শেফা' বলে ডাকে), জয়ন্তী, অন্নপূর্ণা, বাদলী, মোহন, মণি প্রভৃতি দশ বারোটি ছেলেমেয়ে এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। সকলেরই বয়স ছয় সাত বছর।** কারো কারো বড় ভাই বা বোন এসেছে, তবে বারো বছর বয়সের উপরে কেউ নেই। শেফা পুকুর থেকে করঙ্গ করে জল আনতে যাচ্ছিল, ঠাকুর নিষেধ করলেন, সুতরাং তার বড় বোন গিয়ে জল নিয়ে এল। বাড়ী থেকে চন্দন বেটে নিয়ে এসেছে। তাই দিয়ে ঠাকুরকে মনের মত করে সবাই সাজালো । একটা নতুন শাড়ী চাদরের মত করে গলায় পরিয়ে দিল। তারপর ফল-মিষ্টির নৈবেদ্য সামনে সাজিয়ে দিয়ে শেফা পূজা করতে শুরু করলো। সংস্কৃত মন্ত্র তারা জানে না, **সহজ সরল বাংলা ভাষায় হাতজোড় করে বলছে, 'আমাদের বাল্যবন্ধু, আমাদের দধিবাহন [দধিবাহন - শেফালীদের বাড়ীর বিগ্রহের নাম], আমাদের নারায়ণ, তুমি কৃপা করবে - আমরা যেন তোমার আদেশ মত চলতে পারি। হে কৃপাময়, আমরা অতি শিশু, আমরা শিশুবয়স থেকে একসাথী, – আমরা চিরকালই যেন সাথী হয়ে থাকতে পারি। তিনি বলুন – আমাদের কথাগুলো, আমাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে কিনা। জানতে চাই, তিনি বলুন। আমাদের দয়া করে বলতে হবে।' ঠাকুর তখন বললেন, 'তোমরা যা বলেছ আমি শুনেছি। আমি খুব খুশী হয়েছি। আমি আশীর্বাদ করছি তোমরা চিরকাল আমার সাথী হয়ে থাকতে পারবে।'** শেফা কাঁদতে লাগলো । ঠাকুর বললেন, 'তুমি কাঁদছো কেন?' শেফা বললো, 'আমরা থাকতে পারবো তো?' ঠাকুর তখন চন্দন নিয়ে সকলের কপালে দিয়ে দিলেন। ওরা গান গাইলো – 'গোপাল নারায়ণ, গোপাল ঠাকুর, গোপাল গোঁসাই' । গাছের পাতা এনে ঠাকুরের পায়ে দিল। জয়ন্তী সুরকী গুলে পায়ে লাগিয়ে দিল। শেফা বললো, 'তাঁর পা তো এমনিই লাল। আর লাল করবার দরকার কি?' শেষে শেফা পূজারিণীর ভঙ্গিতে ভোগের থালা নিয়ে ঠাকুরকে নিবেদন করলো। ঠাকুর একটু মুখে দিয়ে সবাইকে প্রসাদ দিলেন। এইভাবে সহপাঠীদের পূজা সাঙ্গ হলো। ঠাকুরের ভক্ত বর্ষীয়ান পথচারী দুই-একজন যারা সেদিন সেই পূজা দেখেছিল, তারা সবাই একমত যে, এত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পূজা করতে তারা পূর্বে কখনো দেখেনি। ঠাকুরও তেমনি অন্তর-ঢালা ভালবাসা দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

এরপর খাওয়া-দাওয়া শুরু হ'ল। ওখানেই সবাই খাওয়া-দাওয়া করলেন, তারপর বেলা চারটে পর্যন্ত বিশ্রাম করলেন। চারটের সময় প্রফুল্ল হোড়, মাণিক, কেরামত এবং আরও দুই-একজন নিমন্ত্রিত ছেলেরা এল। ঠাকুরকে প্রণাম করে ওরা খাওয়া-দাওয়া করলো। **ওরা সবাই বললো, "চিরকাল যেন আমরা একত্রে থাকতে পারি।" ঠাকুর বললেন, "তোমরা আমার অন্তরের।"**

এইভাবে বালক ঠাকুরের সপ্তম জন্মতিথির উৎসব পালিত হ'ল। ঠাকুর ছয় বৎসর পূর্ণ করে সাতে পড়লেন।

অবলা জীবের প্রতি বালক ঠাকুরের ভালবাসা

একদিন বালক উজানচর কাছারির পিছনে কলাবাগিচায় বসে আছেন এমন সময় হরিচরণ লাঠি হাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বালককে জিজ্ঞাসা করলো "গরুটা কোনদিকে গেছে দেখেছো?' হরিচরণের ক্রুদ্ধ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। শশা গাছটা শাখাবিস্তার করে ঝাঁকা বেয়ে উঠেছে - উপরে কচি কচি ডগায় অনেকগুলি শশা হয়েছে - এতো ফল ফলেছে যে সবাই খেয়েও শেষ করতে পারবে না । গরুটা যদি দুই একটা ডগা খেয়ে চলে যেত তবে হয়তো হরিচরণ এতটা রাগ করতো না। শুধু ডগাই খায়নি , গাছটাকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। বালক মুস্কিলে পড়লেন :গাভীটাকে যদি দেখিয়ে দেন তবে আর ওর হাড়গোড় থাকবে না। আবার জানিনা বললেও মিথ্যা কথা বলা হবে। বালক জিজ্ঞাসা করলেন "কি হয়েছে হরিচরণদা তুমি এতো চটেছো কেন?" হরিচরণ বলে চটবো না? ও আমার শশা গাছটাকে শেষ করে দিয়েছে। ওকে আজ মেরেই ফেলব। বলো কোন দিকে গেছে? বালক জবাব দিলেন 'গরুটা কি জানে ওটা তোমার গাছ?' ও খাবার জিনিস পেয়েছে, খেয়েছে - নিজের মনে করেই খেয়েছে ওর দোষ কি? ওকে মারবে কেন? বালকের কথায় হরিচরণের রাগ পড়লো না, আবার জিজ্ঞাসা করলো, "বলো কোন দিকে ও গেছে"। এবার বালক বললো, " তুমি ওকে অযথা মারধর করবে। আমি জানলেও বলবো না । উত্তেজিত হরিচরণ সেদিন বালকের যুক্তি মানতে পারে নি; **কিন্তু পরে বুঝেছিলো কতটা সৎসাহস নিয়ে বালক নিরপরাধ গাভীটিকে অযথা নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই শিশু বয়সেও সত্যকে তিনি বজায় রেখেছেন।**

ঠাকুরের খেলার সাথীরা অনেক সময় এমন কাজ করতো যা ঠাকুর পছন্দ করতেন না। একদিন কয়েকটি ছেলে জঙ্গল থেকে বাঘডাশার বাচ্চা ধরে নিয়ে এসেছে। বাঘডাশা হিংস্র জন্তু অনেকটা হায়নার মতো বাচ্চা শিশু পেলে নিয়ে চলে যায়। তা ছাড়া গৃহপোষ্য জন্তু জানোয়ারের বাচ্চা হাঁস , মুরগী তো নেয়ই। ঠাকুর সাথীদের নিষেধ করেন বাচ্চা গুলোকে ধরে রাখতে, বলেন 'ওদের ছেড়ে দিয়ে যায় " ওরা কথা শোনে না। এদিকে বাঘডাশা বাচ্চা খুঁজতে খুঁজতে টের পেয়ে যায় কারা

নিয়েছে এবং ওদের বাড়ী পর্যন্ত্য তাড়া করে। এর পর ওরা ভয়ের চোটে ঠাকুরের কাছে বাচ্চা রেখে দিয়ে যায়। ঠাকুর খাইয়ে দাইয়ে বাচ্চাগুলোকে জঙ্গলের ধারে নিয়ে ছেড়ে দিলেন। ' যা যা' বলে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিলেন। হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটা বাঘডাশা এগিয়ে এলো আর বাচ্চা গুলোকে ধীরে ধীরে নিয়ে গেলো। মাকে পেয়ে বাচ্চা গুলো দুধ খেতে শুরু করলো । বালক ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন , বাঘডাশা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে ঠাকুরের দিকে, যেন বাচ্চা গুলোকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ঠাকুরকে তার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে -- সে বুঝতে পেরেছিল যে ঠাকুর তার কনো ক্ষতির চিন্তা করছেন না। এরপর কলাবাগানে যখন যেতেন ঠাকুর ,বাঘডাশা গুলো প্রায়ই তাঁর আশেপাশে ঘুরে বেড়াতো। আবার মাঝে মাঝে এসে কাছে বসতো যেন কত তাদের আত্মীয়তা ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু অন্য ছেলেদের দেখে তারা সঙ্গে সঙ্গে দাঁতখিঁচিয়ে তাড়া করতো। হিংস্র জন্তু-- সেও স্নেহ প্রেম ভালোবাসার ছোঁয়াচ বোঝে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করে।

মাটির নাড়ু ঠাকুরের স্পর্শে ক্ষীরের নাড়ু

উৎসার - (প্রতিভা ভট্ট্যাচার্য , মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং উজানচরের অতুল চন্দ্র রায়চৌধুরীর কন্যা,) খেলার মধ্যে মাটির প্রতিমা তৈরি করে পুজো করা ছিল একটা প্রধান খেলা। মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ে বুনো ফল, মাটি বালি দিয়ে নৈবেদ্য সাজায়, মাটি দিয়ে নাড়ু তৈরি করে ভোগ দেয়-- শিশুঠাকুর এসে সব ভেঙে ছুড়ে দেন। বাল্য বয়সে খেলার সাথী উৎসার বীরুদা না এলে জমে না আবার বীরুদা এসে পূজা পূজা খেলা ভেঙে দেয়-- সেটাও ভালো লাগে না । সেদিন মন দিয়ে খেলছে উৎসা-- শিশু ঠাকুর এসে সব ভেঙে দিলেন। উৎসা কাঁদতে লাগলো। ঠাকুর বললেন ' কাঁদছিস কেন বোকা!এই নে নাড়ু খা'। মাটির তৈরি নাড়ু গুলো একটি একটি করে ঠাকুর উৎসার হাতে দেন । উৎসাও পরম আনন্দে খেতে থাকে। শিশু মন, তাই কখনো প্রশ্ন জাগেনি । **উৎসা ভাবতো বীরুদা দিলে মাটির নাড়ুগুলো অপূর্ব ক্ষীরের নাড়ুর মতো খেতে লাগে। ঠাকুরের স্পর্শে যে মাটিরও ক্ষীরের মত স্বাদ লাগে , সে বুঝবার বয়স উৎসার তখন ও হয় নি। বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু রোজ ই উৎসা বলতো 'আমার মাটির নাড়ুগুলো বীরুদা কেমন ক্ষীরের ক'রে দেয়। খেতে খুব ভালো লাগে।'**

শিশুঠাকুরের ভক্ত অনুকূল পালের বাড়ী উৎসব

বালক ঠাকুরের বয়স ছয়-সাত বছর। পাঠশালার পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন ছুটি। রাঢ়ির খাল অনুকূল পালের বাড়ী উৎসব হবে। **দোগাছি থেকে রাঢ়ির খাল আড়াই মাইল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ঠাকুরকে পালকী করে নিয়ে যাবে। সত্য কর্মকার রাজী হ'ল না, বললো, 'গোঁসাইকে আমি কাঁধে করেই নিয়ে যাব।' সারা পথ সে ঠাকুরকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে গেল - বলে গোঁসাইর তো কোন ওজনই নেই। প্রফুল্ল হোড়, টগরা, মাণিক, বাদল, মোহন, শচীন, মনু এবং আরও অনেকে গেল রাঢ়িরখালে। ঠাকুরের মাসীমা কমলা দেবীকে নেওয়া হ'ল - তিনি উৎসবের রান্না করলেন।** ছয় সাত বছরের শিশুঠাকুর - তাঁর জন্য উঁচু মঞ্চ করা হয়েছে। সেখানে বসিয়ে সকলে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো। ঠাকুর সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। প্রচুর মানুষ সেদিন এসেছিল শিশুঠাকুরের কাছে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে। **বয়সে শিশু হলে কি হবে - তত্ত্বে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, অলৌকিক শক্তিতে তিনি ভরপুর - তাই কাতারে কাতারে মানুষ আসে তাঁর দর্শন অভিলাষে**। সেদিন যারা তাঁকে চিনতে পারেনি, তথাকথিত শিক্ষার অহমিকায় যারা শিশু বলে তাঁকে উপেক্ষা করেছে, তারাও পরে তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে উজানচর-কৃষ্ণনগরে তামাক সাজার ঘটনা নিয়ে ত্রৈলোক্য সোমের মেয়েজামাই আশু মজুমদারের যে পরিবর্তন এসেছিল, তার সূত্র ধরে বহুদিন তিনি চিন্তা করেছেন। একদিকে বালকের ঐশ্বরিক সত্তা তাঁকে আকর্ষণ করে, আর একদিকে তাঁর নিজের শিক্ষার এবং প্রতিষ্ঠার অহমিকা বাধা দেয়। এই দোটানার মধ্যে পড়ে বেশ কিছু দিন তিনি আড়াল দিয়ে থাকলেন। **অবশেষে মনস্থির করে একদিন ঠাকুরের কাছে পারের কড়ি চাইলেন। সস্ত্রীক বালক ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।** বোধ হয় এই প্রথম বালক ঠাকুর দীক্ষা দিতে শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স ছয় সাত বছর হবে।

ভারী পালকী ডাণ্ডা স্পর্শে হালকা করা

ক্রমে বালকের বয়স সাত-আট বছর হ'ল। একা-একাই ঘুরে ফিরে বেড়ান। মামাবাড়ী দোগাছিতে গেছেন। ওখান থেকে দেশের বাড়ী মেদিনীমণ্ডল মাত্র দেড় মাইলের পথ। বালক হেঁটেই বাড়ী চলেছেন। বর্ষার দিনে নৌকা করে যেতে হ'ত আর শুকনোর দিনে হয় হেঁটে, না হয় পালকী করে যেতে হ'ত। দু'জন ভদ্রলোকও হেঁটে চলেছেন, সঙ্গে চারজন মহিলাকে নিয়ে একটি পালকী। **প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে পালকীর বেহারারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে – তাতে আবার ভারী পালকী নিয়ে চলতে হচ্ছে। নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোকেদের ওরা বললো পালকীটা একটু হালকা করে দিতে। একজন ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কেন, কম পয়সা নেবে নাকি?' বালকের মনে কষ্ট হ'ল - এগিয়ে গিয়ে বেহারাদের থামতে বললেন। ওরা দাঁড়ালো - বালক পালকীর ডাণ্ডা স্পর্শ করে বেহারাদের চলতে বললেন। ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখলো, পালকী এত হাল্কা হয়ে গেছে যে দৌড়ে চলতেও কোন কষ্ট হচ্ছে না, কাঁধে কিছু আছে বলে মনেই হচ্ছে না। তাঁর স্পর্শে কি করে এমন হ'ল জিজ্ঞেস করায় বেহারাদের বালক ঠাকুর**

বললেন, 'বাতাসে কিছু ওজন দিয়ে দিয়েছি' বালক ঠাকুরকে প্রণাম করে বেহারারা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রল। বালক উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের মতনই আছি।' ভদ্রলোক দুইজন যেন কেমন হয়ে গেলেন, বালকের পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। বালক ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেলেন - তাঁর সরলতা, অমায়িকতা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল।

ধর্মগুরু ভোলাগিরি ও সাধক মহিম আচার্যের বালক ঠাকুরের দর্শনলাভ:

ঢাকা শহরে স্বামীবাগে মামার একটি বাড়ী আছে। মাঝে মাঝে বালক সেখানে গিয়ে উঠতেন। আর যখন ঢাকায় যেতেন - কাছেই ছিল বিখ্যাত ধর্মগুরু ভোলাগিরির আশ্রম, সেখানে আশ্রমের পুষ্করিণীতে স্নান করতে যেতেন। সেবার ভোলাগিরি এসেছেন আশ্রমে। বালক স্নান করে একটা গামছা পরে, আর একটা গামছা গায়ে দিয়ে ভাটলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন – হাতে করঙ্গ, পায়ে খড়ম। ভোলাগিরি ভক্ত-পরিবৃত হয়ে কাছেই একটা আমগাছের গোড়ায় বাঁধানো আসনে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে উঠে পুষ্করিণীর দিকে এগিয়ে গেলেন। সবাই তো অবাক! **বালক ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে গদ-গদ-ভাবে হিন্দীতে বললেন, 'মেরা জীবন সার্থক হুই, ব্রহ্ম পুরুষ মিল গেই।' বালক ঠাকুর ভোলাগিরির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, জবাব দিলেন না। আশ্রমের ভক্তেরা সব এসে বালক ঠাকুরের পাদপদ্মে গড় হয়ে পড়তে লাগলো। তাঁর মুখে শুধু এক পরম করুণাময় হাসির রেশ।** জমিদার যোগেশচন্দ্র দাস ভোলাগিরি আশ্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তাঁরই বদান্যতায় ওই আশ্রমটি গড়ে উঠেছিল। বালককে তিনি অনেকদিন ধরেই চেনেন, কারণ বালক ঠাকুরের মামা পণ্ডিত হেরম্বনাথ তর্কতীর্থের কাছে তিনি বহুদিন থেকে বেদান্ত পড়ছেন। সেদিন কিন্তু তিনি পেলেন এক নতুন দিকের সন্ধান। তাঁর অধ্যাপকের টোলের বাইরে যে বালককে কখনও কখনও দেখেন, তিনি অবোধ বালক ন'ন, তিনি অসাধারণ।

মাথাভাঙ্গার বিখ্যাত সাধক, মহিম আচার্য এসেছেন উজানচর-কৃষ্ণনগরে। সেখানে তাঁর বেশ কিছু শিষ্য-ভক্ত আছে। নায়েব ত্রৈলোক্য সোম উদ্যোগী হয়ে তাঁকে এনেছেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে ছোট-খাট বেশ একটা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বহু লোক এসেছে তাঁর দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের আশায়। উৎসব চলছে। দরজা খুলে দিলে ভীড় হয়ে যাবে, তাই গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আগে দর্শন সেরে নিলেন। কথা প্রসঙ্গে বালক ঠাকুরের কথা উঠল। **অনেকেই তাঁর (বালক ঠাকুর) অত্যাশ্চর্য বিভূতির কথা বলতে লাগলেন। এতটুকু বালক কি করে পরম তত্ত্বের**

সন্ধান পেলেন, তাঁরা বুঝতে পারেনা। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে যে, দুরূহ তত্ত্বকে তিনি কি সহজ ভাষায় প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেন! সব শুনে মহিম আচার্য সসম্ভ্রমে বলেন, 'উনি এক জন্মসিদ্ধ মহান, ওঁর কথাই আলাদা। নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন – নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করতে নারাজ। দেখবে, একদিন সারা দুনিয়ার ওপর দিয়ে এক বিরাট পরিবর্তনের ঝড় বইয়ে দেবেন।' একটু পরেই দরজা খোলা হ'ল। ভক্তদের ভীড়ে ঢোকাই দায়। তার মধ্যেই এক ফাঁকে বালক এসে উপস্থিত। মহিম আচার্য তাঁকে প্রণাম জানালেন। দু'একটা কথা হ'ল। বালক একটু হেসে বেরিয়ে গেলেন।

একদিন আনন্দ মাস্টার, পিতার সহকর্মী আশু সেন এবং আরও কয়েকজন নৌকা করে যাচ্ছিলেন। শ্রীমদ্দি স্টেশন ছেড়ে মেঘনা নদীর উপর দিয়ে নৌকা চলছে বেশ কিছুদূর এগিয়েছে এমন সময় উল্টোদিক থেকে ভৈরবের স্টীমার আস্তে দেখা গেল । একে মেঘনা নদীর প্রবল ঢেউ তার ওপর আবার জাহাজ যদি চলে যায় , তবে নৌকা ডুবে যাবে। **সবাই ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। বালক এতক্ষন চুপ করে ছিলেন , বয়োজেষ্ঠ্যদের আতঙ্ক দেখে আশ্বাস দিয়ে বললেন , ' ভয় পাবেন না আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি'। একটু জলহাতে দিয়ে ছিটিয়ে দিলেন , অমনি জাহাজটি থেমে গেলো এবং প্রায় তিনদিন ওই ঘাটে আটকে রইলো। এইভাবে সেই যাত্রায় সবাইকে বাঁচালেন। বালকের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সবাই অভিভূত হয়ে পড়লেন – ওঁকে ভগবান ছাড়া আর কি বলা যায় !'**

মামাবাড়ী দোগাছিতে গেছেন। একটা উৎসব উপলক্ষ্যে হরিসভা হচ্ছে -- বহুলোক জমায়েত হয়েছে। বালক ঠাকুর কয়েকজন সাথীর সঙ্গে হরিসভা দেখতে গেছেন। হাজার বারোশো মানুষের সেই সভায় একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন, গীতা সম্পর্কে আলোচনা করছেন-- আবার বলছেন জন্ম জন্মান্তরের সাধনা না হলে ভগবান দর্শন হয় না ,পাপী তাপীদের ভগবান দর্শন মেলে না। নানারকম ভাবের কথা, রাধা কৃষ্ণের কথা বলছেন আর ভক্তরা চোখ মুছছে। ছোট লাল শালু পরা , গায়ে সাদা চাদর পায়ে একজোড়া খড়ম-- বালক ঠাকুর মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ালেন। অনেকেই তাঁকে চেনে কিছু বলবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে। ঠাকুরের হাতে একটা খালি ঠোঙা। সেটা দেখিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ যা চলছিল এই ঠোঙ্গার কথা-- চাল ,ডাল , মশলা জাতীয় কথা।' সবাই চিৎকার করে বললো ' গোঁসাই , কৃষ্ণের কথা বলুন।'

ঠাকুর বলতে শুরু করলেন,"কৃষ্ণ ও ছিলেন তোমাদেরই মত একজন। তোমরা সবাই যে পথ দিয়ে এসেছ, সেই পথ দিয়েই তিনিও এসেছিলেন। তোমরা যে বোধ নিয়ে এসেছ, তিনিও এসেছিলেন সেই বোধেই। তাঁর মাঝেও ছল, বল, কৌশল ছিল। **তিনি যদি ভগবান হন, তবে জগতে সবাই আমরা ভগবান । আমি যে কৃষ্ণকে জানি, যে কৃষ্ণের কথা বলছি -- তিনি যুগে যুগে আসেন না । তিনি সকল সময়েই সর্বত্র বিরাজ করছেন -- তিনি একযুগেই এসেছেন। আজও সেই যুগেই রয়ে গেছেন -- যুগ একটাই, তিনি কোনো নামানামির মধ্যে নেই, পাপী - তাপী নেই তাঁর কাছে। পাপ - পূণ্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে তিনি বিরাজ করেন। জীবজগতের সবাইকেই নিয়ে যাচ্ছেন তিনি পথ দেখিয়ে'।**

ক্রমশ: ...

রাম নারায়ণ রাম । রাম নারায়ণ রাম । রাম নারায়ণ রাম।